এই লেখাটি "দি ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিষ্ট" এর ৮ম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

বাংলাদেশের সমাজ ও রাষ্ট্রের সংকট এবং তার উত্তরণে মনোবিজ্ঞানীদের পেশাগত দায়-দায়িত্ব

ড. মাহমুদুর রহমান
অধ্যাপক, চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশ নামক আমাদের এই প্রিয় মাতৃভূমি, জন্ম থেকেই আমাদের এই সমাজ ও রাষ্ট্রটি, নানা সংকটে জর্জরিত। স্বাধীনতার ৩৭ বছর পরও আমাদেরকে খুঁজতে হয় প্রকৃত স্বাধীনতার অর্থ। দারিদ্র্য, অশিক্ষা, কুশিক্ষা, কুসংস্কার, দুর্নীতি, সন্ত্রাস, দুর্যোগ, মেধার অস্বীকৃতি, সরকার ও রাষ্ট্রের নিরপেক্ষতার অভাব, পরিবার ও বিশেষ গোষ্ঠীর প্রতি পক্ষপাতপূর্ণ নীতি ও কর্মকান্ড - আমাদের প্রায় সকলকেই স্বাধীন দেশেই পরাধীন, হতাশ, নিরাপত্তাহীন, কর্মবিমুখ, ও বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে। একদিকে পাহাড়সম সংকট আর অন্যদিকে সংকট উত্তরণের নানা প্রচেষ্টা বা নতুন নতুন মডেল ব্যর্থ হবার পরিপ্রেক্ষিতে অনেকে হতাশ হয়ে শেষ পর্যন্ত যেখানে এসে থেমে যান, তা হ'ল এই যে - আমাদের সকলের মানসিকতার আমূল পরিবর্তন ব্যতীত আমাদের জাতীয় সংকট থেকে মুক্তির কোন পথ আপাতত দেখা যাচ্ছে না। বাংলাদেশের সংকট, চূড়ান্ত বিচার বিশ্লেষণ শেষে, কি তাহলে মনস্তাত্ত্বিক সংকট? যদিও অনেকে বলবেন যে সংকট হল - রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক বা সমাজতাত্ত্বিক এবং সাংস্কৃতিক। তাহলে মনস্তাত্ত্বিক সংকটই প্রধান নাকি অন্যান্য সংকটই আমাদের প্রকৃত সংকট? এ প্রশ্নের গভীর তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ প্রয়োজন আছে নিঃসন্দেহে, তবে এই প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয় তা নয়। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সমাজতাত্ত্বিক অবস্থা রাষ্ট্রের অবকাঠামোগত ব্যাপার, আর সংস্কৃতিক বা মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়াসমূহ রাষ্ট্রের উপরি কাঠামোর ব্যাপার, এবং অধিকাংশের মতে অবকাঠামো দ্বারাই সমস্যার আসল সমাধান হতে হবে রাজনৈতিক এবং সেই সাথে অর্থনৈতিক ও সমাজ কাঠামোগত। যদিও কেউ কেউ অন্তত এটুকু মেনে নিতে দ্বিধা করবেন না যে উপরিকাঠামোগত ব্যাপারই – যেমন সাংস্কৃতিক ও মনস্তাত্ত্বিক দিকসমূহ, আমাদের চিন্তা চেতনা, অনুভূতি, আচরণ ও জীবন ধারাই হয়ে উঠতে পারে কাল, যখন তা বাধা হয়ে দাঁড়ায় সমাজ বিকাশের পথে। এই উপরিকাঠামোর উজ্জীবনী শক্তি বা পরিপক্কতাই হয়ে উঠতে পারে সমাজ ও রাষ্ট্রকে নতুন ধাঁচে ঢেলে সাজাবার বা পরিবর্তনের এক বড় হাতিয়ার। মনস্তাত্ত্বিক বিষয়গুলো বাংলাদেশের বর্তমান বাস্তবতায় মূখ্য না গৌণ ভূমিকা রাখবে সে আলোচনা বাদ দিয়েও, আলোচনা প্রয়োজন আমরা আমাদের মনস্তাত্ত্বিক সংকটের দিকগুলো কতখানি চিনতে বা বুঝতে পারি, এবং এই সংকট কাটাতে, জাতি ও রাষ্ট্রকে পথ দেখাতে, আমরা মনোবিজ্ঞানীরা পেশাগতভাবে কতখানি তৈরি আছি, অথবা তৈরি হবার যে পথ, সেই পথ বা পেশাকে নির্মাণের যে উপায় বা পদ্ধতি, তা কতখানি সঠিক বা মানসম্মত? যেহেতু মনস্তাত্ত্বিক সংকট হচ্ছে অদেখা, অজানা, ধরা ছোঁয়ার বাইরে, জটিল ও গভীর এক সংকট, তাই বাংলাদেশের সংকটের মনস্তাত্ত্বিক দিকের সমাধানে অবশ্যই প্রয়োজন-মানসম্মত পেশাগত মনোবিজ্ঞানীদের পেশাগত দায়-দায়িত্ব পালন, অ-মনোবৈজ্ঞানিক ব্যক্তিবর্গের কমন-সেন্স প্রসূত অ-মনোবৈজ্ঞানিক ধারণা দ্বারা যা সমাধান হবার নয়। তাই, বাংলাদেশের মনোবিজ্ঞানীদের কাছে আমার প্রশ্ন, ব্যক্তিগত প্রশ্ন ও পেশাগত পদ্ধতিগত প্রশ্ন, আমাদের বর্তমান কর্মকাণ্ড কি মনোবিজ্ঞানীদের পেশাগত উন্নয়ন ও স্বীকৃতি অর্জনের জন্য যথেষ্ট, যা আমাদের অধিকার দেবে জাতীয় মনস্তাত্ত্বিক সংকট নিরসনে গুরুদায়িত্ব পালনের?

বাংলাদেশে মনোবিজ্ঞান চর্চার বয়স ৫০ বছরের উপরে। অথচ এ দেশে মনোবিজ্ঞানীর সংখ্যা কত জন? অন্তত মাষ্টার্স ডিগ্রীধারী মনোবিজ্ঞানীর সংখ্যা কত? গড়ে বছরে ৩০০ জন করে পাশ করলেও ৫০ বছরে মোট মাষ্টার্স ডিগ্রীধারী সাধারণ মনোবিজ্ঞানী বা বেসিক সাইকোলজিস্ট এর সংখ্যা হওয়া উচিৎ অন্তত ১৫,০০০ জন। আর ১৯৯৬ হতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগে চালু হওয়া চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান বিভাগ হতে এমএসসি/এমএস ডিগ্রীধারী প্রায় ৬৬ জন, বর্তমান অবধি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান বিভাগ হতে এমফিল ডিগ্রীধারী ২০ জন, এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগ হতে শিক্ষা মনোবিজ্ঞানে এমএস ডিগ্রীধারী ব্যক্তির সংখ্যা প্রায় ১০/১২ জন সহ বর্তমানে দেশে অবস্থানরত নানা ধারার ফলিত মনোবিজ্ঞানীর সংখ্যা এমফিল/পিএইচডি ডিগ্রীধারী প্রায় ২৫ জন এবং এমএস পর্যায়ের ফলিত মনোবিজ্ঞানী প্রায় ৭৫ জন মাত্র। মনোবিজ্ঞান চর্চার সাথে যুক্ত মনোবিজ্ঞান শিক্ষক, গবেষক এবং এনজিও কর্মকর্তাসহ একাডেমিক বা প্রশাসক মনোবিজ্ঞানীর সংখ্যা দেশে বর্তমানে আনুমানিক ৪০০ জন। বাংলাদেশের মনোবিজ্ঞানীদের জন্য কোন জাতীয় প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের অস্তিত্ব বর্তমানে অনুপস্থিত বিধায় বাংলাদেশের মনোবিজ্ঞানীদের বিকাশের উপযুক্ত কর্মসূচি তৈরি ও নেতৃত্বদানকারী শক্তির বড়ই অভাব। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর হতে গঠিত হয় বাংলাদেশ মনোবিজ্ঞান সমিতি, যা ২০০১ সাল পর্যন্ত কার্যকর ছিল। ২০০১ সালে বিয়ামে রাত ৯ টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত মনোবিজ্ঞান সম্মেলন শেষে ভোটার বিহীন নির্বাচন এর দ্বারা যে ভারসাম্যহীন অগ্রহণযোগ্য ও কার্যত অবৈধ কার্যকরি কমিটি গঠন করা হয় বাংলাদেশ মনোবিজ্ঞান

সমিতির, তা শেষ পর্যন্ত যে অকার্যকর কমিটি হবে তা সেদিনই বিজ্ঞজনেরা বুঝেছিলেন কমিটি গঠনে অতি উৎসাহী ব্যক্তিরা বুঝতে না পারলেও।

১৯৯৯ সালে গঠিত হয় বাংলাদেশ চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান সমিতি, যা ২০০৬ এর ফেব্রুয়ারীতে এর প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠানে সক্ষম হয়, কিছু আন্তর্জাতিক মনোবিজ্ঞানীর উপস্থিতিতে। এরপর হতে প্রতি বছর একটি বার্ষিক সাধারণ সভা, প্রতি দু'বছরে নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা থাকলেও বাংলাদেশ চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান সমিতির পক্ষে তা করা সম্ভব হয়নি। বাংলাদেশ চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান সমিতি আজ অবধি যে কাজে সবচেয়ে বেশী শক্তি খরচ করেছে তা হল প্রতি বছর ১০ই অক্টোবর বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস পালন- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগ এর সাথে যৌথভাবে; যদিও সংবিধান অনুযায়ী এটিই চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান সমিতির একমাত্র বা প্রধান কাজ হতে পারেনা। এরূপ জনপ্রিয় বা প্রচারমূলক মনোবিজ্ঞানের অ-আ-ক-খ সাধারণ জনতার কাছে পৌছে দেওয়ার সংগঠন হল জিপিসিএস (গ্রুপ ফর প্রমোটিং ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি সার্ভিসেস ইন বাংলাদেশ), সিএমএইচডি (সেন্টার ফর মেন্টাল হেল্‌থ এন্ড ডেভেলপম্যান্ট), বা মনোবিজ্ঞান ক্লাবের ন্যায় ট্রেইনি বেজড্ মনোবিজ্ঞান সংগঠন। পেশাগত মনোবিজ্ঞান সংগঠন হিসাবে চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান সমিতির প্রধান কাজ হল বাংলাদেশে চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানীদের রেজিস্ট্রেশন, লাইসেন্সিং বা সার্টিফিকেশন, অর্থাৎ পেশাগত স্বীকৃতির ব্যবস্থা করা, বাংলাদেশে চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানী পেশার নীতি প্রনয়ন ও তার বাস্তবায়ন এর পথ নির্মান করা। এ কাজ করতে হলে চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান সমিতির প্রতিটি সদস্যকে বাৎসরিকভাবে নয়, প্রতি মাসেই তৎপর থাকতে হবে - পেশাগত নীতিমালা তৈরি থেকে শুরু করে, বর্তমানে চালু পেশাগত প্রশিক্ষণ কোর্সের মান নির্ধারণ, মান যাচাই, কোর্সের এক্রিডাইটেশন, ইন্টার্নশিপ বা প্লেসমেন্ট চালু ও মূল্যায়ন, নূতন গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় প্লেসমেন্ট চালু, সুপারভিশন এর মান যাচাই ও মান উন্নয়নে দায়িত্ব পালন, পূর্ণ সদস্যদের জন্য কন্টিনিউইং প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট এর সিলেবাস প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়ন, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মানসিক স্বাস্থ্যসহ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজির নানা সুনির্দিষ্ট বিশেষজ্ঞ গবেষণার ক্ষেত্র তৈরি, তার প্রয়োগ বা প্র্যাক্টিসের কর্মকাণ্ড চালু, সংশ্লিষ্ট জাতীয় নীতিমালা প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়নে বিশেষজ্ঞের ভূমিকা পালন করার মত ক্রেডিবিলিটি অর্জন– সরকারী ও বেসরকারী সকল পর্যায়েই। বাংলাদেশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি এসোসিয়েশন (বিসিপিএ) এখনো চলছে স্ফুলিঙ্গের ন্যায়, আবেগ তাড়িত হয়ে, ট্রেইনি নির্ভর, যেখানে সবকিছু ব্যক্তির ইচ্ছায় চলে গঠনতন্ত্রের মূল লক্ষ্য ও কর্মপদ্ধতির লিখিত নীতিমালা সমূহের তোয়াক্কা না করেই, এবং এর ফলে গোটা সংগঠনটির কোন ঐক্যবদ্ধ লক্ষ্য, এবং লক্ষ্য বাস্তবায়নের ঐক্যবদ্ধ স্ট্র্যাটেজীসহ, ঐক্যবদ্ধ সচেতন দায়িত্বশীল নেতৃত্ব এবং কমিটেড বিকাশমান কর্মী বা জুনিয়র চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানীদের তারুণ্য শক্তির বড় অভাব দেখা দিচ্ছে। বিসিপিএ পরিচালনার এরূপ বেহাল দশা কোনভাবেই কাম্য হতে পারে না, বাংলাদেশ মনোবিজ্ঞান সমিতির অপমৃত্যু থেকে বিসিপিএ-কে শিক্ষা গ্রহণ করে সাবধান হতে হবে, এ সংগঠনটিকে হাসপাতালের ইন্টেন্সিভ কেয়ার ইউনিটে ভর্তি করতে প্রয়োজন পড়ার পূর্বেই। সকল সদস্যকে এটা মনে রাখতে হবে-"প্রিভেনশন ইজ বেটার দ্যান কিউর," এবং এরূপ প্রিভেনশনের প্রথম কাজ হবে বিসিপিএ'র গঠনতন্ত্র নিয়মিত পাঠ, তার অনুধাবন, গঠনতন্ত্র মেনে চলার মত মনোভাব তৈরি, গঠনতন্ত্রের যে স্পিরিট তার বাস্তবায়নে উপযুক্ত নীতিমালা ও কর্মসূচী প্রণয়ন ও ঐক্যবদ্ধভাবে তার বাস্তবায়ন। এ কাজ আরো সুচারুরূপে সম্পাদন করার জন্য পৃথিবীর শক্তিশালী মনোবিজ্ঞান সমিতি সমূহ, যেমন, APA বা আমেরিকান সাইকোলজিক্যাল এসোসিয়েশন, BPS বা বৃটিশ সাইকোলজিক্যাল সোসাইটি, APS বা অষ্ট্রেলিয়ান সাইকোলজিক্যাল সোসাইটি, CPA বা কানাডিয়ান সাইকোলজিক্যাল এসোসিয়েশন এর গঠনতন্ত্র, কর্মধারা, ইতিহাস, কর্মপদ্ধতি ও তাদের পেশাগত অর্জনের পেছনের মূল রহস্য বা শক্তির সন্ধান ও অনুধাবন করতে হবে বাংলাদেশের বিকাশমান মেধাবী ও দায়িত্বশীল তরুণ মনোবিজ্ঞানীদের।

বর্তমান বাংলাদেশে যত মনোবিজ্ঞান ডিগ্রীধারী ব্যক্তি আছেন, তাদের সবাই কি মনোবিজ্ঞানী? প্রশ্নটি প্রাসঙ্গিক, কারণ একটি লাইসেন্সিং পরীক্ষা চালু হলে এরা সে পরীক্ষায় পাশ করে সবাই উত্তীর্ণ হবে কি? কিংবা এরা যে বিভাগ থেকে ডিগ্রী পেয়েছে, মান বিচার করলে তা এক্রিডাইটেশন পাবে কি? আর কিছু মনোবিজ্ঞানী পাওয়া গেলেও তারা কে কোন জাতের মনোবিজ্ঞানী? এ যাবতকাল আমরা যে মনোবিজ্ঞান সংগঠন গড়ার চেষ্টা করেছি-যেমন, বাংলাদেশ মনোবিজ্ঞান সমিতি ও বাংলাদেশ চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান সমিতি, এ দুটো সংগঠন কি মনোবিজ্ঞানীদের ও চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানীদের সমিতি? না কি তা মনোবিজ্ঞান ও চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান নামক বিষয়ের চর্চা সমিতি? কিন্তু প্রশ্ন হল ব্যক্তি আগে না বিষয় আগে ? ব্যক্তিদের বিষয় সম্পর্কিত জ্ঞান ও তার প্রয়োগ দক্ষতা যথেষ্ট হলেই তো সম্ভব হবে বিষয়ের মান রক্ষা করা। বাংলাদেশের মনোবিজ্ঞানীদের আইডেন্টিটি বা আত্মপরিচয় সংকট দিন দিন ঘনিভূত হচ্ছে - বিশেষত: একাডেমিক মনোবিজ্ঞানী ও ফলিত মনোবিজ্ঞানীদের

কর্মক্ষেত্র সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণার অভাবে এবং বাজারে মনোবিজ্ঞানীদের সেবার চাহিদা বৃদ্ধির কারণে এই সংকট দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। কে কোন ধরনের মনোবিজ্ঞানী এটা আমাদের কনজ্যুমার, ভোক্তা অথবা চাকুরীদাতাদের কাছে মোটেই স্পষ্ট নয় এখনো। ফলে অনেকেই একাডেমিক মনোবিজ্ঞানীর সাথে ফলিত মনোবিজ্ঞানীর আইডেন্টিটি ও প্রত্যাশাকে গুলিয়ে ফেলছেন। চাকরিদাতাগণ সরল বিশ্বাসে একাডেমিক মনোবিজ্ঞানে এমএসসি ডিগ্রিধারী একজন সিনিয়র একাডেমিক মনোবিজ্ঞানীকে বস নিয়োগ করে ফলিত মনোবিজ্ঞানের কোন একটি শাখায় এম ফিল বা সমমানের ডিগ্রিধারী প্রায়োগিক প্রাক্টিসনার জুনিয়র মনোবিজ্ঞানীকে খবরদারির দায় দায়িত্ব দিয়ে, অস্বস্তিকর এক অবস্থার সৃষ্টি করছেন। চাকুরীদাতাদের এ ক্ষেত্রে উচিত হবে নিজেদের কমনসেন্স ধারণা খাটানো বন্ধ করা, এবং জাতীয় পর্যায়ের একাডেমিক ও ফলিত মনোবিজ্ঞানীর কম্পিটেন্স লেভেল এর ব্যাপারে ওয়াকেবহাল এক বা একাধিক মনোবিজ্ঞানীদের বোর্ড গঠন করে, কে কার বস হবে, কে কাকে সুপারভাইজ করবে, এ জাতীয় জটিল টেকনিক্যাল বিষয়গুলোর সমাধানে পরামর্শ গ্রহণ করা ও বছরে একবার অন্তত নিয়োগকৃত মনোবিজ্ঞানী বা ফলিত মনোবিজ্ঞানীদের কাজের মূল্যয়নসহ পরবর্তী বছরের লক্ষ্য ও তা বাস্তবায়নের মডেল বা স্ট্র্যাটেজীর ব্যাপারে কনসালটেন্সি বা পরামর্শ গ্রহণ করে, নিজ সংগঠনের মনোবিজ্ঞানীদের কাজের মান অর্জন ও মনোবিজ্ঞানীদের বিকাশের সুযোগসহ সন্তুষ্টি বিধানের নীতি ও কর্মপন্থা চালু রাখা।

অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হলেও সত্য যে, বর্তমানে মনোবিজ্ঞানীদের কাজের বা সেবার চাহিদা বৃদ্ধি পাবার পরিপ্রেক্ষিতে, কিছু কিছু সেবা সংগঠনের মালিক জুনিয়র মনোবিজ্ঞানী বা শিক্ষানবিশ ফলিত মনোবিজ্ঞানীদের নিয়োগ দিয়ে বসছেন কাউন্সেলর, সাইকোথেরাপিস্ট বা মনোবিজ্ঞানী পদে, তাদের কোন টেকনিক্যাল সুপারভাইজার বা কনসালট্যান্ট ফলিত মনোবিজ্ঞানী নিয়োগ ছাড়াই। এক্ষেত্রে এদের অনেকের, অর্থাৎ বস্‌দের চাওয়াটা বাণিজ্যিক, আর তা হল-সেবা প্রার্থীদের দেখানো, যে "দ্যাখো আমাদের প্রতিষ্ঠানেও রয়েছে মনোবিজ্ঞানী"। কিন্তু এই মনোবিজ্ঞানী কোন মাপের বা কোন জাতের, তার খবর কে রাখে ? এই খবরটিকে স্পষ্ট করতেই প্রয়োজন সরকারীভাবে-মনোবিজ্ঞানীদের রেজিস্ট্রেশন বা লাইসেন্সিং প্রথা চালু করা, এবং জুনিয়র থেকে সিনিয়র পর্যায়ের মনোবিজ্ঞানীদের উত্তীর্ণ হবার মাপকাঠি, কমপিটেন্স বা নিয়োগ পদ্ধতি স্পষ্ট করা, এদের বেতন কাঠামো, সার্ভিস রুল এবং পেশাগত বিকাশে করণীয় দায় দায়িত্ব পরিষ্কার করাসহ সুস্থ ও সুন্দর পথটি বাতলে দেওয়া। অন্যথায় যে যা বোঝে না, তা বুঝেছি, এমন ভান করে, আর যাই হোক মান রক্ষা, নেতৃত্বদান বা সুবিচার সম্ভব হবে না। মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যেই কেউ কেউ হতে পারে প্রশাসনিক ম্যানেজার, কিন্তু তাই বলে তিনিই টেকনিক্যাল সুপারভাইজার হবার যোগ্য নাও হতে পারেন, তার নিজের এরূপ টেকনিক্যাল সুপারভিশনের ঘাটতির কারণে।

বাংলাদেশের অনেক সংকট নিরসনে প্রয়োজন দক্ষ পেশাগত মনোবিজ্ঞানীদের ভূমিকা পালন করার সুযোগ সৃষ্টি ও উপযুক্ত মনোবিজ্ঞানীদের নিয়োগদান উপযুক্ত স্থানে। এ কাজ করতে হবে মনোবিজ্ঞানীদের খুশী করার জন্য নয়, সমাজ ও রাষ্ট্রের সুস্থতা ও উন্নয়ন ত্বরান্বিত ও নিশ্চিত করার স্বার্থেই। বাংলাদেশের সরকারী কর্মচারী ও কর্মকর্তা নিয়োগদান সংস্থা পাবলিক সার্ভিস কমিশন (পিএসসি) থেকে মনোবিজ্ঞানীরা আজ বিতাড়িত সরকারী ভুল সিদ্ধান্তের কারণে, ওটা তাই এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে স্বজনপ্রীতি ও দলীয়করণের দ্বারা মেধাবীদের বিতাড়িত করে জাতীয় মেধার অপচয় সাধন করার সংস্থায়। উপযুক্ত মনোবিজ্ঞানীদের মেধাবী নির্বাচনের সঠিক কাজটি করতে দিলে, পিএসসির নিয়োগ পদ্ধতিতে আজ যে অনাস্থা বা দুর্নীতির অভিযোগ উত্থাপনের সুযোগ থেকে যাচ্ছে, তা বন্ধ হত। বাংলাদেশের ক্রিকেট টিমগুলো চলে স্পোর্টস সাইকোলজিস্ট ছাড়াই। ফলে বাংলাদেশ টিমের মেন্টাল স্টেমিনার ঘাটতির ফলে ঘটে - জেতাবার সম্ভাবনাপূর্ণ খেলাটিতেও পরাজয়ের পর পরাজয়, সিরিজ পরাজয়। বাংলাদেশের স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন মনোবিজ্ঞানী নেই। ফলে শিক্ষার্থীদের উপর পড়ে মানসিক চাপ, যা কখনো হয়ে দাঁড়ায় নির্যাতনের সামিল। এরূপ চাপ ও নির্যাতনের ফলে কেউ হয়ে ওঠে জঙ্গী-সন্ত্রাসী, আবার কেউবা দক্ষতা ও মেধার অপচয় ঘটিয়ে হয়ে পড়ে ড্রপ আউট, হতাশ, বিষন্ন, উদ্বিগ্ন, করে বসে আত্মহত্যা। বাংলাদেশের শিল্প-কারখানাগুলো চলে মনোবিজ্ঞানী ছাড়াই, ফলে সৃষ্টি হয় কর্মচাপ, স্ট্রেস, যা কর্ম দক্ষতা হ্রাস করে, ও অতিরিক্ত চাপে ঘটে অসন্তোষের জ্বালাময়ী প্রকাশ - ভাংচুর, মারামারি, দ্বন্দ্ব, সংঘর্ষ, উৎপাদন বন্ধ হবার মত পরিস্থিতি। বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা চলে চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানী ছাড়াই, ফলে রোগীদেরকে দেওয়া হয় ঔষধ নির্ভর মেডিক্যাল মডেলের চিকিৎসা। এখানে মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কাউন্সিল থাকলেও, রয়েছে "এলাইড হেল্‌থ প্রফেশনাল কাউন্সিল" এর অনুপস্থিতি, বাংলাদেশের উদীয়মান চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানীদের লাইসেন্স বা রেজিষ্ট্রেশন দেওয়ার মত কোন অথওরিটি যেমনি নেই, তেমনি নেই ফিজিওথেরাপিস্ট বা সাইকিয়াট্রিক সোসাল ওয়ার্কারদের জন্যও, যদিও এরা সবাই হতে পারে স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার নন-মেডিক্যাল এলাইড হেল্‌থ পেশাজীবি। বাংলাদেশের

দুর্যোগ, ঝড়-ঝঞ্ঝা ও সামাজিক দ্বন্দ্বে পূর্ণ সমাজে কম্যুনিটি মনোবিজ্ঞানীর অভাবে, ও কাউন্সেলরসহ ক্ষেত্র বিশেষে কম্যুনিটি ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট এর অভাবে, আমাদের সমাজের মানুষেরা ভুগছে নানাবিধ আতঙ্কে, মানসিক চাপে, বিচ্ছিন্নতা, উদ্যমহীনতা ও নিরাপত্তাহীনতায়।

প্রশ্ন হল আর কতকাল এই চৌদ্দ কোটি মানুষের দেশে, মনোবৈজ্ঞানিক চেতনার অভাবে, মনোবিজ্ঞানীদের পেশাগত দায় দায়িত্ব পালন করার মত সুযোগ ও সম্ভাবনা বৃদ্ধি করার অপারগতার কারণে, আমরা ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নানা সংকটে ভুগতে থাকবো যার অনেক খানিই সমাধান যোগ্য, উপযুক্ত বাংলাদেশীয় সংস্কৃতির সাথে সংগতিপূর্ণ মনোবৈজ্ঞানিক মডেল আবিষ্কার ও তার প্রয়োগের দ্বারা। বাংলাদেশের মনোবিজ্ঞানীগণ কি এই পেশাগত দায় দায়িত্ব গ্রহনের জন্য অচিরেই নিজেদের দয়া করে প্রস্তুত করে ছাড়বেন আগে মনস্তাত্ত্বিক সংকট সমাধান করে উপযুক্ত হয়ে, এ দেশের জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় মনস্তাত্ত্বিক সংকট দূর করার মত গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য?

আমার মতে সেজন্য আগে চাই – বাংলাদেশের প্রবীণ মনোবিজ্ঞানীদের অনুপ্রেরণা, তরুণ মনোবিজ্ঞানীদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার মত মেধা ও সাহস অর্জন, মনোবিজ্ঞানে ডিগ্রিধারী এলামনীদের সহযোগিতা, তার সাথে সরকার, এনজিও ও ভুক্তভোগী জনগোষ্ঠির সমর্থন এবং দর্শন ও বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় পেশাজীবিদের কর্মকাণ্ডের সাথে সমন্বয় সাধন করে। তাহলেই আমরা গড়ে তুলতে পারবো মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞান ভিত্তিক আদর্শ সমাজ রাষ্ট্র, যেখানে মানুষ স্বাদ পাবে অনাবিল সুখ, শান্তি, আনন্দ ও সমৃদ্ধির।